source: http://www.samakal.com.bd/details.php?news=29&action=main&option=single&news_id=126192&pub_no=580

সমকাল

শুক্রবার | ২১ জানুয়ারি ২০১১ | ৮ মাঘ ১৪১৭ | ১৫ সফর ১৪৩২

কালের খেয়া

বাংলাদেশের স্থানীয় প্রশাসন

ঐতিহাসিক প্রেক্ষিত

ড. তোফায়েল আহমেদ

বর্তমান বাংলাদেশ বা পুরো বাংলা অঞ্চলের স্থানীয় আঞ্চলিক ও কেন্দ্রীয় শাসন কাঠামো, শাসন ও শাসকের চরিত্র বিশ্লেষণের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটের চর্চার যথেষ্ট ঘাটতি রয়েছে। তাছাড়া বাঙালি জনগোষ্ঠীর নৃতাত্ত্বিক উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ নিয়েও পণ্ডিত সমাজে মতভেদ আছে। তবে উপসংহারে সব ভিন্নমত একত্র করে যে মতটি প্রতিষ্ঠিত হয় তা হচ্ছে, বাঙালি একটি সংকর জাতি। এ জাতির দেহে আদি অস্ত্রাল, দ্রাবিড়-মুণ্ডা, আলপীয়, আর্য এবং মঙ্গোলীয় রক্ত প্রবাহিত। উল্লেখ্য, বাঙালি মুসলমান ও বাঙালি হিন্দুদের নৃতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যে কোনো বড় পার্থক্য নেই। নৃতাত্ত্বিক উৎপত্তি ও বিকাশে এ জাতির বয়স আনুমানিক ৩০ হাজার বছর হলেও শাসনতান্ত্রিক ইতিহাস পাওয়া যায় মোটামুটি ২ হাজার বা বড়জোর ২ হাজার ৫০০ বছরের। প্রাচীন বৌদ্ধ ও হিন্দু শাসন আমলের আগের প্রামাণ্য কোনো ইতিহাস পাওয়া যায় না। আর্যদের ভারত আগমনের প্রায় ১১০০ বছর পর তাদের শাসন উত্তর ভারত [হস্তিনীপুর বা অযোধ্যাকেন্দ্রিক শাসন] থেকে ক্রমেই বিস্তৃতি লাভ করে এবং খ্রিস্টপূর্ব ৪০০ অব্দের দিকে [উত্তরবঙ্গে] বাংলায় মৌর্য শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। পরে ষষ্ঠ ও সপ্তম শতকে গুপ্ত সাম্রাজ্যের অধীন হলেও বাংলায় এককভাবে কোনো কর্তৃত্ব কোনো শাসকেরই ছিল না। ষষ্ঠ শতকের শুরুতে গোপচন্দ্র নামে একজন নৃপতি বঙ্গ ও সমতটে একটি স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করেন। পরে সপ্তম শতকের শশাঙ্ক এবং পরবর্তী সময়ে গোপাল নামে একজন বৌদ্ধ প্রধানকে নৃপতি করা হয়। তার প্রতিষ্ঠিত পাল রাজত্বের [৭৫০-১১৫০] পর সেনদের শাসন [১১৫০-১১৯৯] চলে। সেনদের শেষ শাসক লক্ষণ সেনকে পরাজিত করে তৎকালীন দিল্লীশ্বর কুতুবুদ্দিনের সেনাপতি ইখতিয়ার উদ্দিন বখতিয়ার খিলজি নদীয়া দখল করে লক্ষেষ্টীতে একটি প্রাদেশিক সরকার গঠন করে মুসলিম শাসনের গোড়াপত্তন করেন। এভাবে দিল্লিতে দাস বা মামলুক বংশের পর খিলজি ও তুঘলক বংশ ক্ষমতায় বসে। এদের সবার শাসনামলে ১৫০ বছর ধরে বাংলায় তাদের কর্তৃত্ব ছিল। এরপরের ২০০ বছর দিল্লির শাসনের দুর্বলতার সুযোগে বাংলা এক রকম স্বাধীনভাবেই শাসিত হয়। ১৩৩৮-১৫৭৬ পর্যন্ত এ সময়কালকে সুলতানি আমল বলা হয়। ১৫৭৬-এর পর বাংলা মোগল শাসকদের পদানত হয়, তবে মোগল যুগের পতনের যুগে বাংলার শাসকরা নামমাত্র আনুগত্য প্রদর্শন করলেও প্রায়ই স্বাধীনভাবে রাজ্য পরিচালনা করতেন। ১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধের পর নবাবী শাসনের বাহ্যিক আবরণে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসন চলে। ১৭৬৫ সালে কোম্পানি দেওয়ানি লাভ করে এবং ১৭৭২ সালে প্রকৃত অর্থে বাংলা ব্রিটিশ উপনিবেশ হয়ে যায়। কোম্পানি শাসনের কালপর্ব ১৮৫৮ সাল পর্যন্ত বজায় থাকে। ১৮৫৮ সালের প্রথম স্বাধীনতা সমরের পর এ দেশ সরাসরি ব্রিটিশ সরকারের শাসনাধীনে যায়। এ দুই পর্বের ইংরেজ শাসন দেশের স্থানীয় আঞ্চলিক ও কেন্দ্রীয় শাসনে যুগান্তকারী পরিবর্তন সাধন করে।

স্থানীয় শাসন ব্যবস্থার উদ্ভব ও বিকাশকে এই ২৫০০ বছরের ইতিহাস থেকে ছেঁকে আনতে গেলে অতি সংক্ষেপে যা পাওয়া যায় তা হচ্ছে সেই প্রাচীন বৌদ্ধ এবং হিন্দু আমল থেকেই প্রদেশ/রাজ্য থেকে নিচের দিকে গ্রাম পর্যন্ত একটি শাসন কাঠামো ছিল। সেটিকে খুব সহজভাবে দেখতে গেলে আজকের গ্রাম, মৌজা, ইউনিয়ন, থানা/উপজেলা, জেলা, বিভাগ ও প্রদেশ এভাবে বিভাজন ব্রিটিশ শাসনামলের বিভিন্ন পর্যায়ে করা একটি পূর্ববর্তী প্রতিরূপ হিসেবে দেখা যায়। পাকিস্তান এবং বাংলাদেশে পরবর্তী সময়ে আমরা যা যুক্ত বা বিযুক্ত করেছি তা হচ্ছে কেন্দ্রীয় শাসন বা শাসকের পাশাপাশি নির্বাচিত একটি গণপ্রশাসন কাঠামো। তাই প্রশাসনের ঐতিহাসিক বিবর্তনের ধারাক্রমকে বোঝার জন্য নিচের ছকটি দেখা যেতে পারে। এখানে চারটি

প্রধান সময়কাল বৌদ্ধ ও হিন্দু আমল [৩২১ খ্রিস্টপূর্ব-১২০৬ খ্রি.], সুলতানি আমল [১২০৬-১৫৩৮ খ্রি.], মোগল ও নবাবী আমল [১৫৭৬-১৭৮০] এবং ব্রিটিশ কালপর্বের [১৭৮০-১৯৪৭] স্থানীয় শাসনের একটি তুলনামূলক চিত্র দেখা যাবে।

স্থানীয় শাসন ও স্থানীয় সরকার

ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনামলে স্থানীয় শাসন কাঠামোর পাশাপাশি জনঅংশীদারিত্বের ভিত্তিতে স্থানীয় সরকার কাঠামো গঠন শুরু হয়। ব্রিটিশের ১৯০ বছরের শাসনের প্রথম কালপর্ব কোম্পানি শাসন [১৭৫৭ থেকে ১৮৫৮]। এ পর্বে এ দেশে প্রশাসনের পুনর্গঠন নিয়ে ভারত এবং ব্রিটেনে ব্যাপক আলোচনা হয়। বিশেষত লর্ড কর্নওয়ালিশ ও লর্ড মনরো_ এ দু'জন ব্রিটেনের হুইগ [ডঐরম] এবং ইউটিলিটারিয়ান_ এ দুই মতবাদের অনুসরণে ভারতের প্রশাসনিক সংস্কারে নিজ নিজ মতবাদ খাড়া করেন। কর্নওয়ালিশ আইন, শাসন ও বিচার ব্যবস্থার পৃথকীকরণের পক্ষে বিভিন্ন সংস্কার সাধনে প্রয়াসী ছিলেন। মনরো আর তার সমর্থকরা মাঠ পর্যায়ে একক ও নিরঙ্কুশ ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব দিয়ে মোগল ধাঁচে ঔপনিবেশিক প্রশাসনিক কাঠামো সৃষ্টির চেষ্টা চালান। শেষ পর্যন্ত মনরোপন্থিরা জয়যুক্ত হন এবং এখানে জেলা পর্যায়ে মহাশক্তিধর ডিস্ট্রিক ম্যাজিস্ট্রেট ও কালেক্টরের পদ সৃষ্টি হয়। পরবর্তী সময়ে মহকুমা পর্যায়ে মহকুমা হাকিম। নির্বাহী ও বিচার একক হস্তে সমর্পণ করা হয়। জেলা, মহকুমা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে প্রশাসনিক সহায়তার উদ্দেশ্যেই মূলত স্থানীয় সরকারের কাঠামো সৃষ্টি করা হয়। কলকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজে একটি পৌর প্রশাসন কাঠামো এবং বাংলাসহ ভারতে অন্য ৭ ইউনিয়ন পঞ্চায়েত [১৮৭০], জেলা বোর্ড [১৮৮৫] এবং লোকাল বোর্ড [১৮৮৫] গঠন করা হয়। পরবর্তী সময়ে পাকিস্তান সৃষ্টির পর এ তিন স্থান বজায় থাকে এবং জেনারেল আইয়ুব বিভাগীয় পর্যায়েও এ বোর্ডের সম্প্রসারণ করে [১৯৫৯]।

বাংলাদেশ হওয়ার পরও বেসামরিক প্রশাসনের পাশাপাশি প্রতিষ্ঠান হিসেবে নির্বাচিত স্থানীয় সরকার কাঠামোর ধারাবাহিকতা রক্ষা করা হয়। নির্বাচন ব্যবস্থা ও গঠন কাঠামোর উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন সাধন করা হয়। কিন্তু সংবিধান যেভাবে [ধারা ৯, ১১, ৫৯ ও ৬০] নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে সে অনুযায়ী কার্যক্ষমতা দেওয়া হয়নি। তাছাড়া সমসাময়িককালে কেন্দ্রীয় আইনসভার স্থানীয় প্রতিনিধি [জাতীয় সংসদ সদস্য] এবং কেন্দ্রীয় সরকারে স্থানীয়ভাবে নিয়োজিত কর্মকর্তারা নির্বাচিত স্থানীয় সরকার কাঠামোকে তাদের ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে ধরে নেওয়ায় স্থানীয় সরকারের নির্বাচিত প্রতিষ্ঠানগুলোর সক্ষমতা বৃদ্ধির পরিবর্তে সেগুলো কার্যত অকার্যকর প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। ব্রিটিশ আমল থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত বিস্তৃত স্থানীয় সরকার ও মাঠ প্রশাসনের কাঠামোটি ছকে দেখা যেতে পারে।

ইউনিয়ন, ওয়ার্ড এবং গ্রাম পর্যায়ে সরকারের পক্ষ থেকে কোনো প্রকার প্রশাসক নেই। তবে বিভিন্ন বিভাগের কিছু মাঠকর্মী রয়েছে। প্রতিটি বক্সে নির্দেশিত সাল ওই বিশেষ স্তরটি শুরুর সাল বা বছর হিসেবে ধরে নেওয়া যায়।

বাংলাদেশে বর্তমান সময়ে শাসনকার্যে দলীয় পদ্ধতি পূর্ণভাবে বিকশিত। বর্তমান সময়ে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের নির্বাচনে প্রাপ্তবয়স্ক সব নাগরিক নির্বাচনে অংশ নিচ্ছে। দীর্ঘদিন ধরে এ ক্ষেত্রে মূলত নিম্নোক্ত দুটি সমস্যা বিদ্যমান ছিল। [১] স্থানীয় প্রশাসন ও স্থানীয় সরকার সমান্তরাল সংগঠন হিসেবে বিরাজ করবে নাকি একে অপরটির অঙ্গীভূত হয়ে একক একটি প্রশাসনিক ও উন্নয়ন কাঠামো হিসেবে বিকশিত হবে। [২] প্রশাসন ও স্থানীয় সরকার সংগঠন পৃথক অস্তিত্ব বজায় রেখেই পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে কাজ করবে। সংবিধানের নির্দেশনা অনুযায়ী প্রশাসনিক পুনর্গঠন করতে হলে প্রথমটিই করতে হয়। কালের বিবর্তনে বর্তমানে এ ক্ষেত্রে আরও একটি নতুন সংকটের উদ্ভব হয়েছে। তা হচ্ছে আইন সভার জন্য স্থানীয়ভাবে নির্বাচিত জাতীয় সংসদ সদস্যরা আইন প্রণয়নের পাশাপাশি স্থানীয় উন্নয়ন ও প্রশাসনে শক্তিশালী ভূমিকা পালনে আগ্রহী। স্থানীয় প্রশাসন, স্থানীয় সরকার ও স্থানীয় সংসদ সদস্য_ এ তিনটি শক্তির একত্রিত বা পৃথক ভূমিকা কী হতে পারে এটিই বর্তমানে সিদ্ধান্তে আসার সময়। নইলে সার্বিক স্থানীয় প্রশাসনে শৃঙ্খলা ফিরে আসবে না।